শেষ বিকেলের রোদ্দুর

বই	**শেষ বিকেলের রোদ্দুর**
লেখক	রৌদ্রময়ী টিম
সম্পাদনা	সালমান মোহাম্মদ
শরয়ি সম্পাদনা	সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
বানান সমন্বয়	উম্মু আলি মোহাম্মদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
অঙ্গসজ্জা	*মুহাম্মদ পাবলিকেশন* গ্রাফিক্স টিম

শেষ বিকেলের রোদ্দুর

রৌদ্রময়ীরা

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

নতুন করে দ্বীনের পথ খুঁজে পাওয়া প্রতিটি বোনকে

প্রকাশকের কথা

কুরআন কারিমের সৌভাগ্যবান পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, কোনো দর্শন এবং চিন্তা-চেতনা মানুষের দোরগোড়ায় এবং তাদের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছানোর সবচেয়ে সফল ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মাধ্যম হলো গল্প। আর সেসব গল্প যখন বিবৃত হয় কুরআন-হাদিসের মিশেলে তখন সেগুলো হয়ে ওঠে আরও অনুসরণীয়, শিক্ষণীয় এবং মহিমান্বিত।

'শেষ বিকেলের রোদ্দুর' রৌদ্রময়ীদের এমনই একটি জীবনঘনিষ্ঠ গল্পভাষ্য, যেখানে কুরআন-হাদিসের মিশেলে আমাদের জীবনের বাস্তব গল্পগুলোই ঝিলমিলিয়ে ওঠেছে।

গল্পগুলোর বুনন এতটা সুঠাম ও বস্তুনিষ্ঠ যে, গল্পের চরিত্র ও জীবনপরিক্রমা যেন আপনি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করছেন। গল্পগুলোর আরেকটি সৌন্দর্য হলো, সেগুলো বিবৃত হয়েছে নানা আঙ্গিকে, বিভিন্ন নামে ও শিরোনামে।

রৌদ্রময়ীদের পরিচয় নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর তাওফিকে ইতিমধ্যে তাদের প্রকাশিত দুটি বই—*'রৌদ্রময়ী'* ও *'মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি'*-তে তারা পাঠকহৃদয়ে ব্যাপক জায়গা করে নিয়েছে। রৌদ্রময়ী একটি ফেসবুক পেইজ। একটি টিম। অনেক পথহারাদের পথের দিশা। আল্লাহ তাদের কলম আরও শানিত করুন।

আমরা বই পড়ি। বই দেখি। ভালো-মন্দের আলোচনা-সমালোচনা করি। বইয়ের বিষয়বস্তু ভালো হলে লেখকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই। বই মানসম্পন্ন হলে প্রকাশককে বাহবা দিই। ভালো বইয়ের জন্য লেখক অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু একটি মানসম্পন্ন বই করতে আরেকজনের ঐকান্তিক পরিশ্রম বিশেষ স্মরণীয়; সেটা আমাদের নজরে খুব কমই পড়ে। তিনি হলেন সম্পাদক।

মুহাম্মদ পাবলিকেশনের বইগুলোর পেছনেও যোগ্য সম্পাদকদের পরিশ্রম অনস্বীকার্য। এ ক্ষেত্রে আমি বার বার লেখক, অনুবাদক ও বহুগ্রন্থ সম্পাদক প্রিয় সালমান মোহাম্মদ ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হই। তিনি বরাবরই তার কাজের মাধ্যমে আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বাধ্য করেন। এ বইটিও তার শক্ত হাতেই সম্পাদিত হয়েছে। আল্লাহ তার ছায়াকে আমাদের জন্য আরও দীর্ঘ করুন।

সেই সাথে সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ ভাইকেও আল্লাহ জাজায়ে খায়ের দান করুন। বইটির শরয়ি সম্পাদনা করে তিনিও আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন।

বইটির ভাষাসম্পাদনা, শরয়ি সম্পাদনার পর চূড়ান্তভাবে বানান নিরীক্ষণ করেছেন শ্রদ্ধেয় উম্মু আলি মোহাম্মদ। আল্লাহ তাকে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, মুহাম্মদ আল-ফাতিহ আর সাইফুদ্দিন কুতুজের মতো সন্তানের রত্নগর্ভা মা হিসেবে কবুল করুন।

প্রিয় পাঠক, একটি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকের পাশাপাশি একজন প্রকাশকের ঘামঝরা পরিশ্রমও কম নয়। সে হিসেবে একটি সুন্দর ও বিশুদ্ধ বই পাঠককে উপহার দিতে আমরা কখনোই চেষ্টায় ত্রুটি করি না। তারপরও আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার কারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

বইটির যা কিছু ভালো, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা ভুল ও অসুন্দর তা আমাদের সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার কারণে। আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রত্যেকের শান অনুযায়ী জাজা দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

৩০ জানুয়ারি ২০২০

আমাদের কথা

সকল প্রশংসা আমাদের মহান রবের, যিনি আসমান ও জমিনের মালিক, এক ও অদ্বিতীয়। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তাঁর পরিবার, সকল সাহাবি ও অনুসারীর প্রতি।

গল্পটা ২০১৭ সালের। নারীবাদীদের ব্লগ, পেইজ, গ্রুপের ভিড়ে অনলাইনে বোনদের সুস্থ সাহিত্যের প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাওয়া দায়। ভাইদের পদচারণায় দেশের ইসলামি সাহিত্য মুখর থাকলেও বোনদের একান্ত কথাগুলো বলার, লেখার এবং জানানোর কোনো সুযোগ ছিল না।

সময়টা এমন ছিল, একদলের কাছে নারীদের কথা যেই বলবে সেই নারীবাদী—তো আরেক দলের কাছে হিজাব অর্থই কূপমণ্ডূক অপ্রেসড।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছায় সে-সময় জন্ম নেয় আমাদের ফেসবুক পেইজ 'রৌদ্রময়ী'। উদ্দেশ্য, আমাদের কথাগুলো, কষ্ট-বেদনা, সুখ-দুঃখ, অধিকার-বঞ্চনার গল্পগুলো আর কেউ যখন বলছে না, তখন আমরাই বলব।

কাকে বলব? কী বলব? যে মেয়েটা পরিবারের কঠিন বাধার মুখে দ্বীন মেনে যাচ্ছে, তাকে বলব—তুমি একা নও।

যে মেয়েটা দূর থেকে পর্দানশিন নারীকে দেখে ভাবে, জোর করে সেই হিজাব তাকে পরানো হয়েছে, তাকে বলব—না, তোমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে।

যে মেয়েটা ভাবে ইসলামের নামে মেয়েদের দমন করা হয়, তাকে শুনাব সেই সম্মানের কথা, যা আমাদের মালিক নিজে আমাদের দিয়েছেন, কিন্তু সমাজ আর সংস্কৃতি কেড়ে নিয়েছে তার না জানার কারণে।

জি, আমাদের কাজ জানানো। আমরা জানাতে চাই, আমাদের রবের অনুমতিতে। হিদায়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে। আমরা আশাবাদী, রৌদ্রময়ীর তৃতীয় বইটি আমাদের বোনদের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সাহায্য করবে।

এই বইয়ের কল্যাণময় সবকিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে আর ভুল-ত্রুটিগুলো আমাদের ও শয়তানের পক্ষ থেকে। ভুল-ত্রুটি-সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা আমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাই আর দুআ করি, যেন তিনি আমাদের কাজটি কবুল করে নেন। আমিন।

—রৌদ্রময়ী টিম

সূচিপত্র

হারাম, হারাম, হারাম! ১৩
আনমনে শ্রাবণে ১৬
ভালোবাসার গল্প ৩৪
একাকিত্বের অবসরে ৪০
স্বপ্নের উলটো পিঠ ৪৫
শাশুড়িরাও মানুষ ৫৭
ভাঙা চশমার দুনিয়া ৬৬
কালবৈশাখী ৬৯
কালবুন সালিম ৭৫
দৃঢ়তা ৭৭
গুরাবা ৭৯
জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ৮২
দ্য ম্যান হু লাফস ৮৫
বিয়েবাড়ি, নাকি বাড়াবাড়ি ৮৯
ভ্রান্তি ৯৩
হৃদয় নামের আঁধার ৯৮
সুন্দরীতমা ১০২
কুররাতা আইয়ুন ১০৬
তাহাজ্জুদের তীর ১০৯
একজন আম্মুর গল্প ১১৪
রিযক ১১৬
ফার্স্ট প্রায়োরিটি ১১৯
অন্তরণ ও অনুরাগ ১২১

সময়ব্যবস্থাপনার আদ্যোপান্ত ১২৬
সাক্ষী ১৩০
ফোকাস ১৩৭
শেষ যাত্রার শুরুতে ১৪০
পুতুল ১৪৪
আইলাইনার ১৫১
যখন কেউ থাকবে না ১৫৬
গৃহিণী না চাকরিজীবী? ১৫৮
আজ আমার বিয়ে ১৬২
হার না মানা জীবন ১৬৮
বই পড়া ১৭৪
ট্যাটু ১৭৭
অনিচ্ছাকৃত দাসত্ব ১৮০
অবশেষে ১৮৪

হারাম, হারাম, হারাম!

সিহিন্তা শরীফা

ছোটবেলায় আমি যখন অমুসলিম ছিলাম, প্রথম প্রথম মুসলিমদের সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা ছিল না। তাদের সম্পর্কে জানা প্রথম তথ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল— তারা শূকরের মাংস খায় না। এটা খাওয়া নাকি 'হারাম'। হারাম শব্দটাও এই শূকর দিয়েই শেখা।

তখন আমি খুব ছোট। বাসার কাজে সাহায্যকারী মেয়েটি ছিল আমাদের দুই বোনের খেলার সাথি। ওর কাছেই প্রথম শুনেছিলাম হিন্দুরা যেমন গরু খায় না, মুসলিমরা শূকরের মাংস খায় না। পরবর্তী সময়ে স্কুলের মুসলিমসহপাঠী থেকে শুরু করে চেনাজানা অন্যান্য মুসলিমদের কাছে জেনেছিলাম শূকর নামের প্রাণীটা এতটাই 'হারাম' যে, এর নাম পর্যন্ত মুখে নেওয়া যায় না! অথবা এর নাম শুনলে বা ছবি দেখলেও নাকি ঘেন্না লাগে। এমন কী, আমাদের অমুসলিম কারও বাসায় এই জিনিস রান্না করলে তার একটা কোড নেইম ব্যবহার হতো।

বড় হয়ে যখন আল্লাহ আমাকে মুসলিম বানিয়ে দিলেন, জানলাম হারাম শুধু শূকরের মাংস না, হারাম হচ্ছে মদ খাওয়া, জুয়া খেলা, সুদ-ঘুষের আদানপ্রদান, গান-বাজনা, অমুসলিমদের উৎসবে যোগদান, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বেপর্দায় থাকা, ফরজ ইবাদাত না করা ইত্যাদি ইত্যাদি...।

অদ্ভুত লেগেছিল ব্যাপারটা!

চারপাশের মুসলিমরা সব নিষিদ্ধ কাজই দেদারসে করে বেড়াচ্ছে, অথচ শূকরের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে তারা মহা কট্টর। হাজারটা হারামে ডুবে থাকা ব্যক্তি যত যাই করুক, শূকর ছোঁবে না কিছুতেই।

কেন এমন হলো?

শিশুবেলায় পরিবার আর চারপাশের পরিবেশ আমাদের একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র। এখানে আমরা তাই শিখি যা আমরা দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে বড় হই। আমরা কী ধরনের মুসলিম হব তা নির্ভর করে পরিবার থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ওপর। শূকরের ব্যাপারটাও তাই। আমাদের ইসলামের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শেখানো হোক আর না হোক—এই ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বের সাথে শেখানো হয়। আর তাই আমরা গুরুত্বের সাথেই তা মেনে চলি।

কেমন করে?

বাচ্চাদের ছোট থেকেই জানানো হয় যে এই বিশেষ প্রাণীর মাংস হিন্দু-খ্রিষ্টানরা খায়, আমরা খাই না। মদ, ঘুষ, সুদ ইত্যাদি হারাম বিষয় বড়রা নিজেরাই করে বেড়াচ্ছে, কাজেই এসব নিষেধাজ্ঞা শেখানোর প্রয়োজন বোধ করে না। তাই হারাম বলতে ওরা শুধু ওই একটা জিনিসই বোঝে।

এটা ঠিক যে শূকর আল্লাহ হারাম করেছেন। সেই সাথে অন্য অনেক কিছু হারাম করেছেন যেগুলো আমাদের জানানো হয় না বা জেনেও মানতে চাই না। আমাদের কাছে ইসলাম বলতে শূকর না খাওয়া, দলিলবিহীন কিছু প্রথা মানা আর কিছু অহেতুক আবেগ প্রকাশের মাঝে সীমাবদ্ধ।

আমাদের অধিকাংশ মুসলিম পরিবারে ইসলামের মৌলিক বিধিনিষেধগুলো মানি আর না মানি, কিছু কিছু বিষয়ে আমরা কিন্তু সেইরকম প্র্যাক্টিসিং! আমাদের মেয়েরা সারাজীবন খোলামেলা থেকেও শুধু আজানের সময় বা ইফতারের সময় মাথা ঢাকতে ভুলে না। আমাদের কুরআনের মুসহাফটা কাপড়ে জড়িয়ে উঁচু স্থানে তুলে রাখা হয়, ধুলিমলিন কিতাবটা শুধু রমাদানেই 'খতম' দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাতে নেওয়া হয়। আমরা নিয়মিত সালাত আদায় করলেও সালাতে কী বলছি না বলছি কিছুই বুঝি না। উচ্চারণেও থাকে শত ভুল। আমরা এখন পর্দা করা বলতে বুঝি মাথায় বাঁধাকপির ন্যায় পট্টি বেঁধে মুখে রং মেখে সং সাজা। সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত 'ইসলামিক' তথ্য শেয়ার দিতে থাকি, কোথাও আমিন না বলে যাই না।

সেদিন একটা কৌতুক পড়লাম, একটা ছেলে তার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে বসে ওয়েটারের কাছে জানতে চাইল খাবারটা হালাল কি না। ওয়েটার উত্তর দিল, আপনার সাথের মেয়েটা হালাল তো?

মানবশিশুর মস্তিষ্কে শিশুকালেই যে তথ্যগুলো দৃঢ়ভাবে গেঁথে দেওয়া হয়, সাধারণত সারাজীবন তা মেনে চলে সে। মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে থাকে তা।

একটা মেয়ে যখন এটা দেখতে দেখতে বড় হয় যে টিভিতে মহা আগ্রহে সবাই অভিনেত্রী, গায়িকা আর মডেলদের দেখছে; তাদের রূপের প্রশংসা করছে; তাদের জীবন নিয়ে আলোচনা করছে, স্বাভাবিকভাবেই সে ওই দিকে আকৃষ্ট হয়। নিজেকে ওই অবস্থানে কল্পনা করে। ওই সস্তা মেয়েগুলোকে তখন ওর সবচাইতে দামি বলে মনে হতে থাকে। মাথা, ঘাড়, ঠোঁট বেঁকিয়ে অপ্রকৃতস্থের মতো পোজ দিয়ে সেল্ফি তুলে আপলোড করে সে। কিছু সস্তা লাইকে আবেগে আপ্লুত হয়। ইসলাম থেকে সরে যায় যোজন যোজন দূরে।

একটা ছেলে তার ক্লিন শেইভড বাবা, ধূমপায়ী চাচা, সুদি ব্যাংকে চাকরিরত মামা অথবা প্রেমিক বড় ভাইকে দেখে কখনোই শিখবে না ইসলামে এসবের বিধান কী।

আপনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, নিয়মিত কুরআন পড়েন, হজটাও সেরে ফেলেছেন। অথচ বাসায় হুজুর রেখে ভেবে নিয়েছেন সন্তানদের ইসলাম শেখানোর দায়িত্ব পালন করে ফেলেছেন।

আসলে তা নয় বোন। ইসলাম মানে শুধু সালাত-সিয়াম নয়। ইসলাম মানে আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যেকটা বিধিনিষেধ মেনে চলা, শিশুকাল থেকেই তাদের মনে সঠিক ইসলামকে গেঁথে দেওয়া। তাকে তার রবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আপনার। এই দায়িত্বে অবহেলা করলে প্রতিফল একদিন আপনাকেই পেতে হবে।

ভাই, আপনি যদি এখনই মেয়েকে পর্দা করতে না শেখান, ভবিষ্যতে 'দায়্যুস' হিসেবে গণ্য হবেন। দায়্যুসের জন্য জান্নাত হারাম। শুধু আদেশ না দিয়ে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলুন। রবকে ভালোবাসতে শেখান, তাহলে রবের দেওয়া বিধান আপনাতেই মেনে নেবে সে।

যদি আপনি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করেন, তাহলে সবার আগে নিজে সঠিক ইসলামকে জানুন। কুরআনের অনুবাদ পড়ুন। আজকাল ইসলাম শেখার জন্য তো রিসোর্সের অভাব নেই। আপনি শিখুন, নিজের জীবনে মেনে চলুন। সন্তানের জন্য নিজেকে রোল মডেল হিসেবে তৈরি করুন। ইনশাআল্লাহ তারা শুধু শূকর হারাম ছাড়াও আরও অনেক কিছুই শিখে ফেলবে।

আনমনে শ্রাবণে

আমাতুল্লাহ

মন খারাপ। খুব খুব খুব। সকালে রাফির সাথে ঝগড়া হয়েছে। ওর সাথে ঝগড়া হওয়াতে মন খারাপ না। আমার মন খারাপ অন্য কারণে।

কাল রাতে শাফাআত এসএমএস করেছিল।

সেই পুরানো তিনটি শব্দ। আমার জগৎটা এলোমেলো করে দিল। নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আমার নিজেকে নিজের কাছে অচেনা লাগে, বার বার। আর সহ্য হয় না। আমি হেরে যাই প্রতিবার। কতবার ওকে এসএমএস করতে নিষেধ করেছি। প্রতিবার বলে, আর এসএমএস করবে না। এক সপ্তাহ দু-সপ্তাহ অথবা মাস। যেই নিজেকে একটু সামলে উঠি... তারপর আবার। এ পর্যন্ত যে ওর কয়টা নম্বর ব্লক করেছি তার হিসাব নেই। বিয়ের পর আমি নিজের নম্বরও কয়েকবার বদলিয়েছি। কিছুতেই...

পাঁজরের ভেতর যন্ত্রণা আরও তীব্র হয়। সারা পৃথিবী এক করে কাঁদলেও মনে হচ্ছে আমার কান্না ফুরাবে না। মাথার ভেতরে যেন কোনোভাবে কিছু মৌমাছি ঢুকে গিয়েছে। সারাক্ষণ ভোঁ ভোঁ করে যাচ্ছে ভেতরটায়।

মেয়েদের ভুবনটা খুব ছোট্ট হয়। আমার ভুবনটাও খুব ছোট্ট ছিল। শাফাআতকে নিয়ে। কখনো ভুল করেও ভাবিনি আমি অন্য কারও ঘরের ঘরনি হবো। আমার মধ্যে অন্য কারও সন্তান বাড়বে একটু একটু করে। আমি রাফির সন্তানের মা হতে যাচ্ছি।

সবাই খুব খুশি। আমিও। সত্যিই কি আমিও? নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই অবাক হই। হ্যাঁ, আমিও। আমার সন্তান পৃথিবীতে আসছে।

শাফাআত খবরটা শুনে কী করবে? কী ভাববে? কিছুই করবে না হয়তো! একটুও কি কষ্ট হবে ওর? নাহ্ হবে না হয়তো। কেন কষ্ট হবে? কেন কষ্ট হবে না? ও তো আমাদের সন্তানের জন্য এক জোড়া উলের নীল জুতা কিনে রেখেছিল। খুব জোর দিয়ে বলত, 'দেখবে দিশা, আমাদের প্রথম সন্তান মেয়ে হবে। একদম তোমার মতো। নাম রাখব দিবা।'

আমি হেসে কুটিকুটি হতাম আর বলতাম—'দিশা দিবা! মানুষ তো দুই বোন মনে করবে!'

রাফিও সেদিন খুব আবেগ নিয়ে বলছিল, 'দেখবে দিশা, আমাদের প্রথম সন্তান মেয়ে হবে। একদম তোমার মতো।'

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলাম শুধু! ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কী রাখবে?' আমার কণ্ঠ যেন তখন একেবারে বুকের ভেতর মিশে যাচ্ছিল। যেন কেউ জোরে গলা চেপে ধরে রেখেছিল। রাফির আবেগ আমাকে স্পর্শ করে না। রাফির সব কথায় কাজে আমি শাফাআতকে খুঁজি। মিল পেলে একটু ভালো লাগে। অমিল পেলে গা জ্বলে ওঠে। আজ সকালে ওর সাথে ঝগড়াটাও এই অমিলের কারণেই হয়েছে। রাফি সকালে এক কাপ কফি চেয়েছিল। আমার মনে পড়ে গেল, শাফাআত একবার বলেছিল—কফির গন্ধ ও সহ্য করতে পারে না। আমি রাফিকে বললাম, 'কফির গন্ধ আমার সহ্য হয় না।' ব্যাস শুরু হলো ঠোঁটযুদ্ধ।

রাফির সাথে বিয়ে হয়েছে খুব বেশি সময় হয়নি। নয় মাস হবে হয়তো। আজকাল সময়ের হিসাবও খুব এলোমেলো লাগে আমার কাছে, আমি যেন সেই একটা তারিখেই আটকে আছি।

২৬ সেপ্টেম্বর। সকাল ১০টা। শাফাআত আমাকে বাইকে করে নামিয়ে দিল মোড়ের দোকানের সামনে। আমি ঝাপসা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। কোনো কথা হলো না। ইশারায় বলেছিল এসএমএস দেখতে।

আমি কাঠের পুতুলের মতো বাড়ি ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় আমার বিয়ে, রাফির সাথে। এত দিনেও আমি রাফিকে ভালোবাসতে পারিনি। ওর আবেগ, অভিমান কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না। ওর আনন্দ, উল্লাস অথবা অসুস্থতা সব ব্যাপারেই আমি নির্বিকার, নির্লিপ্ত। রাফিও হয়তো মাঝে মাঝে বুঝতে পারে, তবে কখনো কিছু বলেনি আমায়। ইদানীং বেশ মেজাজ চড়ে থাকে ওর। হয়তো আমার মতো রাফিও হাঁপিয়ে উঠেছে। ওর দিক থেকে অনেক চেষ্টা করেছে ও। সে তো জানে না শাফাআতের ব্যাপারটা, তাই। জানলে হয়তো ফিরেও তাকাত না আমার দিকে। আমার ব্যাপারে ও খুব পজেসিভ। মাঝে মাঝে ওর জন্য আমার মায়া হয়। ভালোবাসা শব্দটা যে আমার পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছে; তাতে তো ওর কোনো দোষ ছিল না।

নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করি। সব ঠিক করতে চেষ্টা করি। তারপর আবার একটা এসএমএস সবকিছু এলোমেলো করে দেয়—কালবৈশাখী ঝড়ের মতো, সব লন্ডভন্ড করে দেয় মাত্র তিনটি শব্দ।

এই সময় স্ট্রেস নিতে নেই। ভেতরে যে আছে তার ক্ষতি হয়। আমি সারা দিন কেঁদে চোখ ফুলিয়ে রাখি। পড়াশোনাও করা হয়ে ওঠে না। রাফি প্রায়ই বাইরে খেতে নিয়ে যায়। আমাকে ঠিক করতে ওর খুব আপ্রাণ চেষ্টা। চেষ্টা থাকাটাই স্বাভাবিক। চোখের সামনে একজন মানুষ সারাক্ষণ কাঁদবে; এটা কে সহ্য করতে পারে? রাফিও পারে না। আমাকে বার বার সান্ত্বনা দেয়। বলে—'আর মাত্র ক'টা দিন পরই ছুটি। তারপর বাড়ি নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।'

আজ রাফি অফিসে যাওয়ার পর আমি শাফাআতকে কল দিই।

'হ্যালো!'

'কাঁদছ কেন?'

'আমি আর পারছি না!'

'দেখো, আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে! আমি প্রেগনেন্ট! প্লিজ আমাকে আর এসএমএস দিয়ো না!'

'কীভাবে পারলে তুমি?'

'এটাই আমাদের তাকদিরে লেখা ছিল!'

'তুমি ফিরে এসো, প্লিজ!'

'এটা সম্ভব না! বুঝতে পারছ না কেন তুমি?!'

ফোনটা কেটে দেয় ওই পাশ থেকে। আমি চুপ করে ফোন হাতে বসে থাকি। যতটা কঠিন হয়ে শাফাআতের সাথে কথা বলেছি এখন যেন তার চেয়ে বেশি ভেঙে পড়েছি। কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ দুটো যেন টসটসে লাল আপেল হয়ে গিয়েছে। রান্নাও করিনি। রাফি অফিসে যাওয়ার সময় যেভাবে আমাকে দেখে গিয়েছিল এসেও একই অবস্থায় পেল। কোনো কথা বাড়াল না, বরং আমাকে অবাক করে দিয়ে ও রান্না করল। আমাকে খাইয়ে দিল।

আমি একবারও ওর চোখের দিকে তাকালাম না। কোন মুখ নিয়ে তাকাব!

খাইয়ে দেওয়া শেষ করে রাফি বলল—'এখন ঘুমিয়ে যাও। ঠিক আছে? আর কাঁদতে হবে না। দেখবে দ্রুতই সুস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

হঠাৎ যেন আমার কি হলো! আমি রাফির গলা জড়িয়ে ধরে একেবারে বাচ্চাদের মতো কান্না করলাম। অনেকক্ষণ কাঁদার পর কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম!

অনেকক্ষণ ঘুমালাম। ফজরের নামাজ পড়া হয়নি। এমনিতে রাফি তাহাজ্জুদের জন্য আমাকে ডেকে দেয়। পড়া হয় না কখনোই। ঘুম চোখে নিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে একেবারে শেষ সময়ে ফজরের নামাজ পড়া হয় সব সময়। আজ মনে হয় ডাকেনি। না কি আমিই টের পাইনি হয়তো। ঘুম থেকে উঠে আরও অবাক হলাম। রাফি নাস্তা বানিয়েছে। টেবিলে সব সুন্দর করে সাজিয়ে প্লেটের নিচে একটা চিরকুট রেখে গিয়েছে। লেখা—

'ম্যাডাম, নাস্তা করে নিবেন। আপনার কফির গন্ধ সহ্য হয় না। তাই কফি ফেলে দিয়েছি। আর সেদিনের জন্য সরি। আমার মনে ছিল না যে, এই সময় অনেক কিছুর গন্ধই খারাপ লাগতে পারে। পুদিনা পাতা এনেছি। র‍্যাকে রাখা আছে। নাস্তার পরে ইচ্ছে হলে চা করে খাবেন। আর হ্যাঁ, আজ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ডেট, মনে আছে তো? আমি সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি ফিরব ইনশাআল্লাহ। রেডি থাকবেন।'

আমি নির্বিকারভাবে নাস্তা শেষ করে চিরকুটটা ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। কফি ওর খুব পছন্দ। র‍্যাকে দেখলাম সত্যিই কফির পটটি নেই। দু'দিন থেকে ঘর-দোর সব এলোমেলো হয়ে আছে। আজ সব গুছালাম। জমে থাকা কাপড় ধুয়ে নিলাম। রান্না শেষ করলাম। শরীর ভালো লাগছে না। কোমরের বাম পাশে ব্যথা করছে খুব। আমার অনিয়ম অবহেলায় ভেতরের মানুষটার যে খুব কষ্ট হচ্ছে সেটাই সে বার বার জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি নিজেই তো এই পৃথিবী ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচি, আর এই আমার মাধ্যমে এখন অন্য একজন পৃথিবীতে আসছে। কীভাবে সব সামলাব আমি!

অনেক দিন পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের টসটসে আপেল চোখগুলো দেখলাম। আমি খুব হাঁপিয়ে উঠেছি। সত্যিই আর পারছি না। আচ্ছা কেন আমি এত কষ্ট সহ্য করছি! শাফাআত তো এখনো আমাকে আগের মতোই ভালোবাসে। তাহলে কীসের ভয়ে আমি সব ছেড়ে ওর কাছে চলে যেতে পারছি না? আয়নার ভেতরের মানুষটা যদি জবাব দিতে জানত!

দরজার বেল বাজল। হয়তো রাফি এসেছে ডাক্তারের কাছে নিতে। ছেলেটা সবকিছুর এত হিসেব রাখে কীভাবে! কীভাবে ওর সব খেয়াল থাকে! আমি আয়নার সামনে থেকে নড়লাম না। দু-তিন বার বেল বাজিয়ে রাফি নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিল। রুমে এসে আমাকে আয়নার সামনে দেখে খুব আদুরে গলায় বলল, 'আচ্ছা! আমার বউ তাহলে এখন রেডি হবে!'

আমি ওর দিকে তাকালামও না, কোনো উত্তরও দিলাম না। ওর এই আদুরে কণ্ঠটা খুব অসহ্য লাগে আমার।

আমি আয়নার সামনে থেকে সরে রেডি হতে যাব, এমন সময় ও আমাকে পেছন দিক থেকে ধরে আমার সামনে এক গুচ্ছ গোলাপ ধরল। আমার কানের কাছে এসে খুব নরম কণ্ঠে বলল, 'শুনেছি কার যেন গোলাপ খুব পছন্দ। তার বারান্দা ভরা নাকি অনেকগুলো গোলাপের টব ছিল?'

আমার ভেতরটা হুহু করে কেঁদে উঠল। হ্যাঁ, আমার গোলাপ খুব পছন্দ। আমি গোলাপ ভালোবাসি বলে শাফাআত এত্তগুলো গোলাপগাছ গিফট করেছিল। ও বলত, 'একটা দুটো ফুল দিয়ে কি হবে। দুদিন পর ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে। তাই এত্তগুলো টব দিলাম। যেন এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভুলতে না পারো।' পুরো বারান্দা টবে ভরে গিয়েছিল। মাকে বলেছিলাম—সব আমি কিনেছি।

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। রাফির হাত থেকে গোলাপের গুচ্ছটা নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেললাম। কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বললাম, 'কে তোমাকে এসব ন্যাকামো করতে বলে? আমার এসব ভালো লাগে না! কতবার বলেছি তোমাকে!'

রাফি প্রচণ্ড বিস্ফোরিত চোখে আমার দিকে তাকাল, কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে চোখ নামিয়ে ফেলল এবং সাথে সাথেই ফ্লোর কাঁপিয়ে অন্য রুমে চলে গেল।

আমি নিজের এমন অদ্ভূত আচরণে নিজেই অবাক হলাম। কেন এমন করলাম আমি! এমন ব্যবহার করলাম, যেন বিরাট কোনো অপরাধ করে ফেলেছে ও; যেন নিজের বউকে গোলাপ দেওয়াটা হত্যা থেকেও বড় কোনো অপরাধ!

সেদিনের পর থেকে রাফির সাথে আমার আর দরকার ছাড়া কথা হয় না। কখন ফিরবে, কী খাবে, কী বাজার করবে, কবে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে—এই আমাদের কথা। তাও ও এত শর্টে উত্তর দেয় যে, আমারও আর কিছুই বলার মতো থাকে না। আদর-

সোহাগ, রাগ-অভিমান, ভালোবাসা-অবহেলা সবটা দিয়েই হয়তো ও চেষ্টা করেছিল। আমিও চেষ্টা করেছিলাম। 'করেছিলাম' বলছি কেন, বরং প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেই যাচ্ছি। কিন্তু আমার মনের দুয়ার মনে হয় একেবারে ইট-পাথর দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। শুধু বন্ধ না, এখন আর আমার মনের কোনো দুয়ারই নেই। খুব নির্লিপ্ত দিন কেটে যাচ্ছে আমাদের। আমিও নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছি। কাঁদি না মোটেই। ও বাসায় এসেও এখন অফিসের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অথবা সোশ্যাল মিডিয়া। আমিও নিজেকে ওর থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টাই করতে থাকি সারাক্ষণ। তবে আমার কাছে ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়া অসহ্য লাগে। সবই অসহ্য লাগে আমার। আমি ফোন সাইলেন্ট করে রাখি সারা দিন। মা আমার ফোনে অনেক কল দিয়ে না পেয়ে রাফির ফোনে কল দেয়।

ভোরে তাহাজ্জুদের জন্য অনেকক্ষণ ডাকল রাফি। আমি উঠে বসলাম। রাফি আমার পাশে বসে বলল, 'দিশা, একটা কথা বলি?'

'হুম, বলো।'

'দেখো, তোমার সমস্যাগুলোর কথা আমি কখনো তোমাকে জিজ্ঞেস করিনি।'

আমার বুকের ভেতরটায় কী যেন একটা ধাক্কা দিল হঠাৎ।

'জিজ্ঞেস করবও না। অনেক কথা অন্য কাউকে না বলাই আমাদের জন্য ভালো। আফটার অল, আমরা সবাই তো মানুষ!'

আমি চুপ করে শুনছি শুধু। কী বলতে চাচ্ছে—ও! আমার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'আমার মনে হয় তুমি তোমার কষ্টের কথাগুলো আল্লাহকে বলতে পারো। তিনিই তো সুস্থতা দেওয়ার মালিক। আম্মুর জন্য সারা দিন কাঁদলেই তো তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন না, তাই না? তাই প্রতিদিন তাহাজ্জুদে তোমাকে ডেকে দিই।'

আমি স্বস্তির শ্বাস নিলাম একটা। উঠে ওজু করে তাহাজ্জুদ পড়লাম। কিন্তু কী বলব আল্লাহকে? আল্লাহ তো সবই জানেন! তাই আর কিছুই বললাম না। শুধু নামাজটাই পড়ে নিলাম। রাফির পেছনে।

রাফির অফিস নেই। তাই সকালে দুজন একসাথে হাঁটতে বের হলাম। ও সব সময়ই হাঁটতে বের হয়। আজ আমিই নিজে থেকে ওর সাথে যেতে চাইলাম। ভালোই লাগল আমার। যদিও হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি সাথে আছি তাই রাফি আস্তে হাঁটছিল। কিন্তু কেমন যেন অদ্ভূত একটা দূরত্ব বজায় রেখে। আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে, সেদিনের অভিমান ওনার এখনো যায়নি। কি ভেবে যেন নিজে থেকেই ওর হাতটা ধরে 'সরি' বললাম।

ফিরে এসে রাফি বলল, আজ সে নাস্তা বানাবে। পরোটা করবে। ও ভালোই রান্না শিখেছে। আমার থেকেও ভালো। মাঝে মাঝে মনে হয়, মায়ের থেকেও ভালো। আমি পরোটা বেলতে গিয়ে বার বার আটকে যাচ্ছিলাম। তা নিয়ে খুব হাসল ও। প্রথমবার খেয়াল করলাম, ও হাসলে ওকে খুব সুন্দর দেখায়। দাঁতগুলো আঁকাবাঁকা তো, তাই হয়তো। হাসির মধ্যেই একটা এসএমএস আমার ফোনে। কখন যেন রাফি ফোনটার সাইলেন্ট অফ করে রেখেছে।

ফোনটা হাতে নিয়ে রাফি বলল, 'দিশা, তোমার ফোনে আননোউন নম্বর থেকে একটা এসএমএস এসেছে। লিখেছে, 'নীল জুতা জোড়া কী করব?' কার নীল জুতা?'

আমি ফোনটা হাতে নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম, 'চিনি না তো নম্বরটা! কেউ হয়তো ভুল করে আমাকে এসএমএস করে দিয়েছে।'

রাফি এতে খুব হাসল, বলল, 'রিপ্লাই করো, কুরিয়ার করে দিন... হাহাহা...'

আমি নাস্তা শেষ করে ওয়াশরুমে গিয়ে খুব কাঁদলাম। কিন্তু আমি তো নিজেকে নিজে কথা দিয়েছিলাম, বলেছিলাম, 'আমি আর কাঁদব না।' কি করছি আমি এসব! আমি রাফিকে ঠকাচ্ছি! না, কোথায় ঠকাচ্ছি। বিয়ের পর তো শাফাআতের সাথে আমার আর কোনো যোগাযোগ হয় না। যতবার ও যোগাযোগ করতে চেয়েছিল, আমিই তো এড়িয়ে গিয়েছি। কতবার নানা অজুহাতে নিজের সিম চেঞ্জ করেছি। শাফাআতের কত শত নম্বর ব্লক করেছি তার হিসেব নেই। নিজের ভেতরে নিজে কুঁকড়ে যাচ্ছি বার বার। মনকে কী করে বুঝাই! কত সহজে রাফি আমার কথা বিশ্বাস করল। আমি যে এ ধরনের হিপোক্রেসিকে জঘন্য রকমের ঘৃণা করি। আমি নিজেই কি হিপোক্রেট হয়ে যাচ্ছি? এত এলোমেলো কেন আমার জীবনটা?

অনেক দিন পর মিমের সাথে দেখা হবে আজ। ওর কিছু বই আমার কাছে ছিল। সেগুলো নিতে আসবে। রাফি কিছু ড্রাই ফুড এনে রাখল, যেন বান্ধবী আসবে সেই খুশিতে আমি তোড়জোড় না শুরু করে দিই। মিমের আগমনে আমার খুশি লাগার মতো কিছুই নেই। মিমের সাথে আমার কখনোই তেমন জমে না। শুধু বই, পড়াশোনা এসব নিয়েই কথা হয়। মিম না এসে মিথিলা এলে হয়তো সত্যিই খুশি হতাম।

মিম আসতে আসতে বিকাল হয়ে গেল। দু'জনে একসাথে চা করে খেলাম। এত দিন ক্লাসে কেন যাচ্ছি না, তা নিয়ে মিম খুব বকুনি দিল আমাকে। আমার হঠাৎ কেন যেন মিমকে খুব ভালো লাগতে শুরু করল। অনেক কথা শুরু হলো ওর সাথে। কত গল্প, ছোটবেলার গল্প, বড়বেলার গল্প—এক বিকেলেই আমাদের সব বলা হয়ে গেল।

কথায় কথায় মিমকে বললাম, 'বিয়ে করে আমি ভালো নেই।'

'কেন?'

'আমি রাফিকে ভালোবাসতে পারছি না।'

'ধ্যাত! এটা আবার কেমন কথা!' হাসতে হাসতে বলল মিম।

আমি আরও জোর দিয়ে বললাম, 'সত্যি!'

'হ্যাঁ, তুই বললি সত্যি আর আমি বিশ্বাস করলাম। রাফি ভাইয়ের বাচ্চা পেটে নিয়ে বসে আছিস! আর বলছিস, 'আমি ওকে ভালোবাসতে পারছি না' হাহাহা...!

'বাচ্চা পেটে নিতে হলে কি ভালোবাসা লাগে নাকি?'

এবার মিম একটু গম্ভীর হয়ে গেল; বলল, 'কী সমস্যা?'

'মিম, আমি শাফাআতকে ভুলতে পারছি না কিছুতেই।'

'এসব ফালতু কথা।'

'যাহ! বাদ দে। তুই বুঝবি না। সারা দিন পড়া নিয়েই পড়ে থাক তুই।'

'ফালতু কথাই তো! কে তোকে ভুলতে বলছে? চাইলেই কি ভুলে যাওয়া যায়? যত ভাববি ভুলে যেতে চাই, তত মনে পড়বে। ভুলে যেতে চাই করেই তো তুই নিজেই বার বার মনে করছিস। 'ধর, তুই একটা অঙ্ক করলি। তারপর সারাক্ষণ মনে মনে ভাবতে থাকলি অঙ্কটা আমি ভুলে যেতে চাই। পারবি ভুলতে? অঙ্কটা ভুলে যেতে চাই এই ভাবনার কারণেই তো অঙ্কটা তোর মাথায় আরও জেঁকে বসবে।'

আমি কিছুই বললাম না। শুধু মিমের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। ঠিকই তো বলছে ও। এই মেয়ে পড়াশোনার বাইরেও কিছু জানে, তার মানে!

'যাক, কী হয়েছে? খুলে বল।' বিজ্ঞের মতো বলল মিম।

'আমার বিয়ের পর থেকে এখনো আমি রাফিকে ভালোবাসতে পারছি না মিম। সবকিছুতেই আমার শাফাআতের কথা মনে পড়ে। এর বাইরে আর কিছুই ভাবতে পারি না আমি।'

'একটা ঘটনা ঘটেছে। তা তো মনে পড়বেই। কেন, তোর কি ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়ে না?'

আমি উপর নিচে মাথা নাড়লাম।

'তাহলে? এসবও মনে পড়বে। 'ভুলে যেতে চাই, ভুলে যেতে চাই' বলে হাজার বার জপলেও কিছুই হবে না। এক কাজ করতে পারিস।'

‘কী?’

‘যখনই শাফাআতের কথা মনে পড়বে তখনই ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির রাজিম’ পড়বি। ‘রাব্বি আউজুবিকা মিন হামাজাতিশ শাইয়াতিন। ওয়া আউজুবিকা রাব্বি আই-ইয়াহদুরুন’[১] পড়বি। আর বার বার নিজের জন্য ও শাফাআতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবি। ইসতিগফার করবি।

‘‘আউজুবিল্লাহ’ কেন পড়ব? শাফাআত কি শয়তান নাকি?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

‘শাফাআত কেন শয়তান হতে যাবে! তবে, শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণেই তো বার বার ওর কথা তোর মনে পড়ে। শয়তানের কাজই তো মানুষকে হতাশ করে দেওয়া। আল্লাহর রহমত থেকে মানুষকে নিরাশ করে দেওয়া। আর বার বার ইসতিগফার করলে এমনিতেও মনটা ফ্রেশ লাগে।’

‘শাফাআতের সব কথা আমার মনে আছে। সব। সারাক্ষণ সেগুলো কানে বাজতে থাকে। তারিখসহ মনে আছে। কত তারিখে শাফাআত আমাকে প্রথম ফুল দিয়েছিল, কী কথা হয়েছিল, সব মনে আছে।’

‘হুম, মাথার ভেতর সারাক্ষণ সেই ভিডিওগুলো রিপ্লে করলে তো মনে থাকবেই। এটা মোটেই শার্প মেমোরির পরিচয় না।’

‘মিম, আমি সিরিয়াসলি বলছি। কিন্তু রাফির কোনো কিছুই আমার মনে থাকে না। ওর কোনো ব্যাপারেই আমার কিছু যায় আসে না। আমি খুব নির্বিকার ওর সব ব্যাপারে। এমনকি ও অসুস্থ হলেও আমার টেনশন হয় না। বাসায় দেরিতে ফিরলেও না। অথচ শাফাআতের একবার সর্দি হয়েছিল, তাতেই আমি অস্থির হয়ে ওঠেছিলাম।’

‘আচ্ছা...’

‘তুই বুঝতে পারছিস না আমার সমস্যাটা।’

‘বোঝাবুঝি দিয়ে কি হবে! তুই বলে যা, আমি শুনছি।’

‘আমি আর পারছি না। এটাকে সংসার করা বলে না।’

‘কেন? রাফি ভাই কি তোকে কোনোভাবে হার্ট করে?’

‘নাহ, ও তো অনেক কেয়ারিং। সেদিন রান্না করে আমাকে খাইয়ে দিল। আমি সেদিন ওকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম যে ও একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল; কিন্তু আমাকে কিছুই বলেনি।’

---

[১] আরবিপাঠ: رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ *[সুরা মুমিনুন : ৯৭-৯৮]*

‘জিজ্ঞেস করেনি যে তুই কেন কাঁদছিস?’

‘নাহ, ও মনে করে যে আম্মু অসুস্থ, তাই আমার মন খারাপ থাকে।’

‘আচ্ছা...’

‘জানিস, সেদিন ও আমার জন্য গোলাপ এনেছিল। গোলাপ দেখে আমার শাফাআতের কথা মনে পড়ে গেল। আমি সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওর সাথে খুব মিসবিহেইভ করেছিলাম। পরে অবশ্য আমারই খুব খারাপ লেগেছিল।’

‘তো মিসবিহেইভ করাতে উনি রাগ করেননি?’

‘চেহারা দেখে তো মনে হয়েছিল এখনই আমাকে খুন করে ফেলবে। কিন্তু... নাহ, ও কিছুই বলেনি আমাকে।’

‘তারপর?’

‘তারপর একদিন নাস্তা বানিয়েছিলাম দুজন একসাথে। আমরা একসাথে হাঁটতেও গিয়েছিলাম।’

‘আচ্ছা;’

‘জানিস, ও কী করেছে?’

‘কী?’

‘ওর কফি খুব পছন্দ; কিন্তু আমি একবার বলেছিলাম যে, আমি কফির গন্ধ সহ্য করতে পারি না। যখন বলেছিলাম তখন অবশ্য একটু রাগারাগি হয়েছিল; কিন্তু পরে ও কফির পটটাই ফেলে দিল।’

‘কি! তুই কফির গন্ধ সহ্য করতে পারিস না? কবে থেকে? কলেজে তো তুই শ্রেষ্ঠ কফিখোর ছিলি। একটু ফাঁক পেলেই মিথিলাকে নিয়ে কফি খেতে ছুট দিতি।’

‘শাফাআত একবার বলেছিল যে, কফির গন্ধ ও সহ্য করতে পারে না। সেদিন থেকে আমিও কফি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম।’

‘বাহ! বিরল প্রেম! তুই শাফাআতের জন্য কফি খাওয়া ছেড়েছিলি। আর রাফি ভাই তোর জন্য কফি খাওয়া ছাড়ল। কফির সব কোম্পানি তো ডুবল। এত্ত কফি কফি বলে আমার এখন কফি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাকে খেতে দিবি তো?’

‘বাসায় কফি নেই তো। বললাম না ও ফেলে দিয়েছে।’

‘আচ্ছা বাদ দে। লাস্ট ক্লাসের নোটগুলা আমাকে একটু দেখিয়ে দে।’

আমি লাস্ট ক্লাসের নোট খুঁজতে শুরু করলাম। পড়াশোনার কোনো হদিস নেই অনেক দিন, কী কোথায় রেখেছি সব এলোমেলো হয়ে আছে। খুঁজতে খুঁজতে মিমের দিকে তাকালাম। দেখি ও খুব উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। হয়তো কীভাবে ফিরবে সেটাই ভাবছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে! তুই আবার কার বিরহে উদাস হলি।'

মিম খুব গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'দিশা, যদি কিছু মনে না করিস তোকে কিছু কথা বলি?'

'এত ভনিতা করে কথা বলছিস কেন?'

'এমনি। বলব?'

'বল, পারমিশন নেওয়ার কি আছে!'

'তোদের বিরল প্রেমের ব্যাপারে!'

এবার আমি খাটের কোণে জড়সড় হয়ে বসলাম। শাফাআতের ব্যাপারে মিম কি বলতে চাইছে; এতটা উদাস, এতটা গম্ভীর হয়ে; আবার যেন আমার বুকের ভেতরে ধুকপুক শুরু হলো।

মিম নিজে ডান হাতের একটা আঙুল দেখিয়ে বলল, 'প্রথমত, শাফাআতের সাথে তোর যে সম্পর্কটা ছিল সেটা ছিল হারাম। এটা কি তুই মানিস?'

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

মিম ডান হাতের আরেকটি আঙুল উঠিয়ে বলল, 'দ্বিতীয়ত, তুই এখনো সেই হারাম সম্পর্কটা মিস করছিস এবং আল্লাহ যা তোর জন্য নির্ধারণ করেছেন তা অবহেলা করছিস। এটা যে ভুল করছিস তা কি তুই মানিস?'

আমি আবারও মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি রাফিকে ঠকাচ্ছি; কিন্তু কীভাবে বল? শাফাআতের সাথে তো বিয়ের পর আমি কোনো যোগাযোগও রাখিনি...'

মিম বলল, 'দেখ, দুইটা গুনাহ এর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তোকে অনেক বিপদে ফেলতে পারতেন, যেমন : তোর রিলেশনের কথা সবাই জেনে যেতে পারত। তোর নামে বাজে কথা ছড়াতে পারত। আরও অনেক কিছুই হতে পারত। প্রতিদিনের পেপারেই আমরা এসবের রেজাল্ট দেখি।'

‘হুম!’

‘কিন্তু আল্লাহ তোর গুনাহগুলো গোপন রাখলেন। গুনাহের জন্য শাস্তি না দিয়ে তোকে দুইটা নিয়ামত দিলেন।’ এবার মিম বাম হাতের একটা আঙুল উঠিয়ে বলল, ‘এক. রাফি ভাইয়ের মতো এত্ত কেয়ারিং একজন হাসব্যান্ড, যিনি তোকে এতটা সাপোর্ট করছেন।’

আমি বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে রইলাম।

‘একবার ভেবে দেখ, সারা দিন পরিশ্রম করে এসে উনি নিজে রান্না করে তোকে খাইয়ে দিলেন। কেন?’

‘কেন?’ আমি অবুঝের মতো প্রশ্ন করলাম।

‘কারণ, তোর কেয়ার করেন। তোকে ভালোবাসেন।’

‘একবার শাফাআতের এসএমএস দেখেছিল ও। তোর মনে আছে একবার শাফাআত আমার জন্মদিনে বাচ্চাদের উলের নীল জুতা গিফট করেছিল?’

‘হুম।’

‘একদিন এসএমএস করে জিজ্ঞেস করেছিল, সেই জুতাগুলো ও কী করবে। সেটা রাফি দেখে ফেলেছিল।’

‘তারপর?’

‘আমি স্বাভাবিকভাবে বলেছিলাম, হয়তো কেউ ভুল করে আমার নম্বরে এসএমএস দিয়ে দিয়েছে।’

‘উনি বিশ্বাস করলেন?’

‘হ্যাঁ, অবিশ্বাস করার তো কিছুই নেই। ও তো শাফাআতের ব্যাপারে কিছুই জানে না।’

‘দেখ, কত সরলভাবে তোকে বিশ্বাস করেন উনি।’

‘সেটাই।’

‘খেয়াল কর, গোলাপ ফেলে দেওয়াতেও তিনি তোর উপর রাগ দেখাননি। স্বাভাবিকভাবেই তো এতে তার রিয়েক্ট করার কথা ছিল, তাই না? তা না করে, বরং তোকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন।’

‘হুম।’

মিম বাম হাতের অন্য আঙুল উঠিয়ে বলল, ‘দুই. তোর বেবি আসছে পৃথিবীতে।’

‘হুম।’

‘কত মানুষ এই দুটো নিয়ামতের জন্য প্রতিদিন আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলছে। কত মানুষ এমন আছে, যাদের বিয়ে হচ্ছে না। কত দুআ করছে তারা বিয়ের জন্য। কত মানুষ এমন আছে যাদের বেবি হচ্ছে না। দিনের পর দিন তারা আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র একটা বাচ্চা চায়। মা ডাক শুনতে চায়। আছে কিনা বল?’

‘হুম, আছে।’

‘কিন্তু, তুই! তুই এই সব নিয়ামত পেয়েও কি করছিস? বলছিস নাহ আল্লাহ আমি আবার গুনাহ করতে চাই।’

আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। চুপ করে মিমের কথা শুনছি।

‘জানিস, আল্লাহ যখন কাউকে কোনো নিয়ামত দেন আর সে যদি অকৃতজ্ঞ হয় তখন আল্লাহ কী করেন?’

আমার বুকের ধুকধুকানি খুব বেড়ে গেল হঠাৎ। কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী করেন?’

‘মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা জানিস না তুই?’

‘কোন ঘটনা?’

‘মুসা আলাইহিস সালাম যখন নীল নদ পাড়ি দিয়ে তার কওমকে নিয়ে এক জনপদে পৌঁছলেন, তখন সেখানে তাদের জন্য জান্নাত থেকে খাবার আসত।’

‘হ্যাঁ, এটা জানি। মান্না সালওয়া।’

‘হুম... কিন্তু তারা জান্নাতের খাবার কিছুদিন খেয়ে বোর হয়ে গেল আর আগের খাবার মিস করতে লাগল।’

‘হ্যাঁ, ওরা জমিতে উৎপন্ন হয় এমন খাবার চেয়েছিল।’

‘এজ অ্যা রেজাল্ট, তাদের থেকে আল্লাহ তাঁর নিয়ামত ফিরিয়ে নিলেন।’

আমার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরা শিহরিত হয়ে উঠল। মিম বলে যাচ্ছে,

‘এখন যদি আল্লাহ তোর জীবন থেকে রাফি ভাইকে আর তোর বেবিকে নিয়ে নেন, তাহলে কি তুই সেটা সহ্য করতে পারবি?’

আমার চোখ হঠাৎ খুব জ্বালা করতে শুরু করল। আমি নিজের মুখ হাতের আড়ালে লুকিয়ে, মাথা নিচু করে বসে রইলাম। মিম কথা থামাল না তবুও,

‘তখন কী করবি, তুই? খুশি হবি? বলবি, ‘ইয়েস, আমি এখন শাফাআতের কাছে ফিরে যেতে পারব, আলহামদুলিল্লাহ! এটাই কি বলবি?’

‘নাহ ... না, কখনো না...’ আর্তনাদের সুর যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কণ্ঠে। বাইরের বৃষ্টির কিছু ফোঁটা আমার গাল গড়িয়ে নেমে যেতে লাগল অবলীলায়।

‘তুই তো বলছিলি, তুই নাকি এখনো রাফি ভাইকে ভালোবাসতে পারিসনি, তাহলে এখন এভাবে কাঁদছিস কেন?’

আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

‘ভালো যদি নাই বাসতে পারিস, তাহলে রাফি ভাই তোর জন্য কী কী করেছে এসব বলার সময় তোর কণ্ঠ ও চেহারা এত প্রফুল্ল কেন দেখাচ্ছিল? আর শাফাআতের নাম নিতেই তোর মুখটা অন্ধকার হয়ে যায় কেন?’

আমি এবারও কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। কেন যেন হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

মিম আর কথা বাড়াল না। হঠাৎ ও ক্লাসের নোটগুলো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেন আমার অশ্রু ওর চোখের ফ্রেমে ধরাই পড়েনি।

যাওয়ার সময় শুধু বলে গেল, ‘দিশা, কষ্টগুলো শুধু আল্লাহকে বলিস। আর কাউকে না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকেও না।’

শাফাআতকে কল দিয়ে বললাম, ‘নীল জুতাগুলা পানিতে ফেলে দিয়ো।’

‘মানে?’

‘পানি চিন না? পচা পুকুর, ডোবা অথবা ড্রেন? এগুলোর মধ্যে তোমার যেটা পছন্দ হয় সেখানে নীল জুতাগুলা ফেলে দিয়ো।’

‘তুমি...’

‘কথা শেষ হয়নি আমার। শোনো, ভদ্রভাবে বলছি, আমাকে আর কল অথবা এসএমএস কিছুই দিবা না তুমি।’

‘দিশা, আমি...’

‘বললাম না কথা শেষ হয়নি আমার। কী বলতে চাও? তুমি আমাকে ভালোবাসো? এতই যখন ভালোবাসো, তাহলে সেদিন যখন বিয়ের জন্য বলেছিলাম সেদিন কেন

ভেজা বিড়ালের মতো বলেছিলে, 'আমার বাসা থেকে এখন আমাকে বিয়ে দিবে না, দিশা' কেন?'

'আমি তো...'

'চুপ করো। কী আমি তো? এসএমএস দিয়ে বলেছিলে সন্ধ্যায় বাসা থেকে পালাতে? কেন পালাব আমি আমার বাসা থেকে? যে ছেলে নিজের বাবা-মাকে নিজের পছন্দের কথা বলতে পারে না, কেন আমি তার সাথে পালাব?'

'দিশা...'

'এমন মেরুদণ্ডহীন কেঁচোর সাথে আমি কেন পালাব?' আমার কর্কশ কণ্ঠ আরও গাঢ় হলো, 'আর আমার বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই শুধু একটাই কথা, 'তুমি ফিরে এসো!' ফাজলামো মনে হয় সব তোমার কাছে?'

'আর পার...'

'কেন আমি আমার সংসার ছেড়ে পালাব? ঠিক আছে, মানলাম তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো। আমি রাফিকে ডিভোর্স দিয়ে এলে কি পারবা সামাজিকভাবে আমাকে বিয়ে করতে? নাকি তখনও বলবা, 'আমার, আব্বু-আম্মু তো ডিভোর্সি মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিবে না'—কি পারবা?'

শাফাআত কোনো কথা বলল না।

'জানি তখনো বিয়ে করবা না তুমি।'

'দিশা... আমি...'

কথা শেষ করার আগেই ফোনটা কেটে দিলাম। নম্বরটা ব্লক করে দিলাম। খুব হালকা লাগছে নিজেকে। যেন অনেক দিনের ভারী কোনো বোঝা কাঁধ থেকে নেমেছে।

আজ অনেক দিন পর আমি মনমতো সাজলাম। তার জন্য সাজলাম যাকে আমার মালিক আমার জন্য পছন্দ করেছেন। কোনো কেঁচোর সাথে রাস্তার পাশে ফুচকা খাওয়ার জন্য সাজিনি আজ। বাইরে খুব বৃষ্টি। রাফির ফিরতে খুব দেরি হচ্ছে তাই। আজ প্রথমবার ওর দেরিতে আমার ভেতরটা চৌচির হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৫/৭ বার কল দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আর কতক্ষণ লাগবে। রাফিও অবাক হচ্ছে আমার টেনশন দেখে। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে আমার শরীর খারাপ করেছে কিনা। কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা।

দরজায় বেল বাজার সাথে সাথে দ্রুত দরজা খুলে দিলাম। আমার সাজ দেখেও রাফি অবাক হয়েছে। কিছু বলেনি। তবে মুখের ভাব ভঙ্গিমায় আমি বুঝেছি।

রাতের খাবার শেষে রাফি বারান্দায় গিয়ে বসল। কাল অফিস নেই। তাই ঘুমানোর তেমন তাড়াও নেই। বাইরের বৃষ্টি আরও বাড়ছে। আমি দুই কাপ কফি করে বারান্দায় গেলাম। অবাক দৃষ্টিতে রাফি আমার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে কফির কাপটা নিল। রাফি ইজি চেয়ারে বসেছে। আমি ওর পাশেই ভিজা ফ্লোরে বসলাম। আমাকে ফ্লোরে বসতে দেখে রাফিও ফ্লোরে এসে বসল। আমার থেকে একটু দূরে।

কারও মুখে কোনো কথা নেই। রাফিও হয়তো আমার মতোই ভেবে পাচ্ছে না কী বলবে। বৃষ্টির শব্দও যেন খুব মধুর কোনো সুর তুলছে।

আমার হঠাৎ কবিতা শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে। কলেজে থাকতে বৃষ্টি হলেই জানালার পাশে কফির কাপ নিয়ে বসে কবিতা পড়তাম।

বললাম, 'কবিতা...'

একই সময়ে রাফিও বলল, 'কবিতা...'

দুজনের একই সময়ে একই কথায় দুজনই হেসে উঠলাম। তারপর, বললাম, 'আচ্ছা তুমি আগে বলো।'

'বৃষ্টি হলে আমার কফির কাপ নিয়ে কবিতা পড়তে খুব ভালো লাগে। পড়ব? তুমি শুনবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

রাফি উঠে গিয়ে একটা ডায়েরি এনে আমার পাশে বসল। তারপর পড়া শুরু করল—

'কোনো আনমনে শ্রাবণে
হয়তো এক পলকে
চেয়েছিনু তোর হাসি মুখ
একটু আবেগ ভরে।

কোনো ক্লান্ত প্রহরে
হয়তো একটু অবহেলার ছলে
চেয়েছিনু তোর হাসি মুখ
একটু আপন করে।

বুকের বাঁ পাঁজরে
রেখে তোর অভিমান
চেয়েছিনু তোর হাসি মুখ
একটু সুখের ঘোরে।

জীবনের কাঁটা ভরা পথ
ফেলে আসা শত কলরব
মিছে করে সব প্রেমালাপ
তোকে নেই নিজের করে।

বেঁধে নিয়ে বুকের খাঁচায়
আজ বড় জানতে মন চায়
সুখ পাখি কোন অজানায়,
লুকিয়ে কোন ঠিকানায়?

তুইও কি এতটাই অসহায়?
বন্দি হয়ে আমার ভাষায়!
পালাতে কি চাস একাকী?
আমায় একা নিঃসঙ্গ রাখি?

জানিসই তো এই ধরায়,
সুখ খোঁজা বড় বেশি দায়।
দুনিয়াটা মস্ত কারাগার,
মনে কর হাদিসটি আবার।

সুখ শুধু মিলবে সেথায়

তোকে নিয়ে যেতে চাই যেথায়।

সব ভুল ফেলে পিছে

হারাবো দুজনে জান্নাতের বাগানে।'

বারান্দার আলো আঁধারের খেলায় আমি রাফির চোখের দিকে তাকালাম। বাইরের বৃষ্টির ফোঁটাগুলো রাফির চোখে চিকচিক করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবিতাটা কার লেখা?'

'হবে হয়তো, কোনো নামহীন কবির!'

'কাকে নিয়ে লিখেছে?'

'লিখেছে হয়তো, কোনো নামহীন প্রিয় কাউকে নিয়ে।'

'সেই নামহীন কবি কে বলবে, তার নামহীন প্রিয় তাকে খুব ভালোবাসে। তাকে ছাড়া থাকতে পারবে না, কিছুতেই না।'

শ্রাবণের ঘন বর্ষণ কখন যেন আমাদের দুজনের চোখে এসে বাসা বেঁধেছে। খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ গাঢ় কালো।

ভালোবাসার গল্প

সানজিদা সিদ্দীকি কথা

আমি নিলয়। আমাকে অফিসের সবাই ডাকে হুজুর নিলয়। নিবিরের ধারণা আমার থুতনির কাছে সব মিলিয়ে ২০টার মতো দাড়ি আছে। আমারও অনেকটা সেরকমই ধারণা, কিন্তু ভয়ে গুনি না। পরে যদি সংখ্যা বিশের নিচে নেমে যায়! নিবিরের আরেকটা ধারনা আছে, যা নিয়ে আমি বেশ আতঙ্কিত। বউ রাগী হলে নাকি সে দাড়ি ধরে হালকা একটা টান দিলেই সব সাফা কিরকিরা। ভাগ্যিস এখনও বিয়ে করিনি।

আপাতত আমি আছি আমাদের ছাদের পানির টাংকির উপর। আমার পাশে নিবির। আজ ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ রাত ১২টা পেরিয়ে ১৫ তারিখের রাত একটা ছুঁই ছুঁই। সব ঠিকঠাক থাকলে আজ রাতে ওর রিমি নামের মেয়েটার সাথে ফুল দিয়ে সাজানো ঘরের মধ্যে লাজুক ভঙ্গিতে কথা বলবার কথা ছিল। বিয়েটা ও নিজেই ভেঙে দিয়েছে। যদিও এখানে কিঞ্চিৎ আমার হাত আছে; তবে তার জন্য আমি একদমই দুঃখিত না।

নিবির বিশেষ কোনো কথাবার্তা বলছে না। ওর গা কিছুক্ষণ পর পর কেঁপে কেঁপে উঠছে। সম্ভবত কাঁদছে। আমিও ওর কান্না থামানোর খুব একটা চেষ্টা করছি না। মাঝে-মধ্যে মানুষকে ঠিকমতো কাঁদার সুযোগ দেওয়া জরুরি। ও আমার ছোটবেলার বন্ধু, যাকে বলে প্রাণের বন্ধু। দুই বছর আগে আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম দাড়িটা রেখেই দিব, আর প্যান্টটা টাখনুর উপরেই পরব, নিবিরের মতো ঘোর নাস্তিক ছেলে এরপরও আমার পিছু ছাড়েনি। একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ওর থেকে পুরোপুরি দূরত্ব বজায় রাখব, যেহেতু সঙ্গ ভয়ংকর জিনিস। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে ভাগ্যিস তা করিনি। যদিও একটা সূক্ষ্ম বাউন্ডারি আমি রেখেছিলাম তো বটেই।

রিনি বিশাল বড়লোকের মেয়ে। পুরো পরিবার নাস্তিক। আর নিবিরদের অবস্থাও বেশ ভালোই। নিবিরের সাথে রিনির সম্পর্ক প্রায় তিন বছরের। এই তিন বছরের মধ্যে নিবিরও আরজ আলী মাতুব্বরের বই পড়ে পুরোদস্তর নাস্তিক হয়ে ওঠে। গত কয়েক মাস ধরে নিবির নাকি নারী অধিকারের বিভিন্ন সেমিনারেও দুর্দান্ত বক্তৃতা দেয়। ফেসবুকেও সেলিব্রিটি হয়ে উঠছে বেশ।

রিনিকে নিয়ে নিবির আমার সাথে খুব বেশি একটা কথাবার্তা বলত এমন না। সম্ভবত আমি উৎসাহ দেখাতাম না বলেই। ওকে ফেসবুকে আনফলো করে রেখেছিলাম বলে রিনির সাথে পরিমিত কিংবা অপরিমিত হাসি হাসি মুখ করে তোলা ছবিগুলো আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। সে যাই হোক। মাস পাঁচেক আগে নিবির আমাকে ফোন দিয়ে বলেছিল বাসায় আছি কি না। আসবে। কণ্ঠ শুনে আমি বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম যদিও, তবু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললাম 'আয়'।

নিবির এসেই সোজা চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

—মেয়ে মানুষ হলো বেইমানের জাত।

আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললাম 'হু'।

—কি হয়েছে শোন! আমি গেছি বসুন্ধরা সিটি মোবাইলের স্ক্রিনপ্রটেকটর লাগাতে। সাথে রুমকি। বুঝছিস তো কোন রুমকি। ওই যে আমাকে ভাই ডেকেছে। আমার অফিসেরই জুনিয়র। ও নাকি মোবাইল কিনবে। তো দেখি কি রিমির মতো সাদা সালোয়ার কামিজ পরা একমেয়ে একছেলের হাত ধরে সামনের দোকানে ঢুকছে। ওমা কাছে গিয়ে দেখি রিমিই। আমি কিছু না বলে চুপচাপ বের হয়ে এলাম। রাস্তাঘাটে সিন ক্রিয়েট করা কোনো ভালো কাজ না।

—হু।

—বাসায় এসে ফোনে জিজ্ঞেস করলাম সাথে এটা কে ছিল যে হাত ধরে ঝুলে পড়া লাগে। বলে কি বন্ধু! আমি বলি বন্ধু শেখাও আমাকে? এইভাবে বন্ধুর হাত ধরার কি আছে। আমাকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পাঠ শেখায়। চিন্তা কর। চোরের মায়ের বড় গলা জানতাম এত দিন। এখন দেখি চোরের গলা আরও বড়।

আমি আমার মুখটা যথাযথ সমান্তরাল রাখার চেষ্টা করে বললাম, কিন্তু তোরাই তো ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বলিস। তোদের কিছু মতবাদ তো আমি পড়েছি। সেই হিসেবে রিনির কথা আমার খুব বেশি অযৌক্তিক লাগছে না কিন্তু। এই যেমন তুই তোর পাতানো বোন রুমকিকে নিয়ে মোবাইলের স্ক্রিনপ্রটেকটর কিনতে গেলি, কিন্তু বোনের হাত ধরে হাঁটিস নাই, এটা তোর ব্যক্তিস্বাধীনতা। আবার রিনি গেছে ওর বন্ধুকে নিয়ে, কিন্তু হাত ধরে হাঁটল, এটা ওর ব্যক্তিস্বাধীনতা। আমি বলছি না, তোদের মতবাদ বলে আর কি।

নিবির কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ও দরবেশ জাতীয় কিছু হলে এতক্ষণে আর আমাকে পাওয়া লাগত না। ভাগ্যিস ও মানুষ, নাস্তিক মানুষের দরবেশ হওয়ার নিয়ম নেই। নিবিরের মুখটা হঠাৎ করে একটা হতাশ মানুষের মতো হয়ে গেল। আমার কেন জানি ভীষণ মায়া হলো দেখে। যদিও মুখে কিছুই বললাম না। কোনো কিছু না বলেই উঠে চলে গেল ও। মনে মনে হয়তো নিজেকে গালি দিচ্ছে এমন কষ্টের দিনে আমার কাছে এসেছিল বলে! এর পর কীভাবে রিনি আর নিবিরের ঝগড়া মিটেছিল তা আমার জানা নাই। তবে মিটেছিল কোনোভাবে। হয়তো ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো থিওরি অনুযায়ী। এইসব আমার না জানলেও চলবে।

এক মাস আগে ওদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়। রিনির ইচ্ছা ভ্যালেন্টাইন-ডে-তে বিয়ে করার। তেমনই হয়েছিল। কিন্তু বিপত্তি বাধে কিছু দিন আগে।

নিবিরের মা টিপিক্যাল এই উপমহাদেশীয় বাঙালি মহিলা। উনি কথায় কথায় নাকি ফোনে তার হবু বেয়ানকে নিবিরের বোনের বিয়েতে উনারা মেয়েকে কি কি দিয়ে রুম সাজিয়ে দিয়েছেন তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, গয়নার সেট আমিন জুয়েলার্সের কোন শাখা থেকে কিনেছে সেটাও নাকি দামসহ বিবৃতি দিয়েছেন।

এর পরের ঘটনা নিবিরের মুখে শুনে যদিও আমার খুব দুঃখ পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কেন জানি বেশ হাসি পেয়ে গেল। আমি মানুষ হিসেবে সম্ভবত খারাপ প্রকৃতির। নইলে এমন একটা দুঃখের বিষয় নিবির সেদিন এসে আমাকে বলছে, আর আমি কোনোমতে হাসি চেপে মুখ দুঃখী দুঃখী করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি। সে যাই হোক, ঘটনা অনেকটা এ রকম।

শুক্রবার সকাল। নিবিরদের বাড়িতে সকাল একটু দেরিতেই হয়। ১০টা ১১টার আগে কেউ ঘুম থেকে উঠে না। নিবিরের বাবা সোবহান সাহেব মাত্র নাস্তা খেয়ে চা নিয়ে বারান্দায় বসেছেন। আর নিবির দাঁত মাজতে মাজতে বারন্দার খাঁচায় থাকা লম্বা লেজের পাখিদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছে। কলিংবেল বাজতেই কুলি করে কোনোমতে ড্রইং রুমে গিয়ে ও যা দেখল, তা ওর ভাষ্যমতে অষ্টম আশ্চর্য টাইপ ব্যাপার। রিনি বসে আছে ডিভানের উপর। ওর মা বড় সোফার কোণার দিকে বসা। কাহিনি দেখতে চায়ের কাপ নিয়ে সোবহান সাহেবও উপস্থিত। রিনি গভীর মনোযোগের সাথে সামনে কাশফুলের মাঝে দৌড়াতে থাকা কিশোরের যে বিশাল পেইন্টিং আছে সে দিকে তাকিয়ে আছে। সোবহান সাহেব পরিস্থিতি বোঝার জন্যই হাসিমুখে বলে উঠল—'মা রিনি কেমন আছ?'

আংকেল আমি সোজাসুজি কথা বলার মানুষ। তাই তবলার ঠুকঠাক বাদ দিয়ে সোজা কথায় আসি। আমি মানুষ হিসেবে কেমন জানি না; কিন্তু সমাজে থাকা অসংগতি নিয়ে

কাজ করি। সাম্যবাদ নিয়ে কাজ করি। আমার বাবাও করে। সেখানে আপনাদের মতো শিক্ষিত পরিবারের মানুষ টিপিক্যাল শাশুড়ির মতো ইনিয়ে বিনিয়ে আমার বাবার কাছে যৌতুক দাবি করবেন এর থেকে লজ্জার ব্যাপার আমার কাছে আর কিছু নেই। আর আমার মা আমার বন্ধুর মতো। আপনি যা বলেছেন আন্টি, তা সবই কিন্তু মা আমার সাথে শেয়ার করেছে; এক নিশ্বাসে বলে গেল রিনি।

নিবির ঝট করে মার দিকে তাকাল। মানোয়ারা বেগমের মুখ দেখে লজ্জা আর রাগ আলাদা করে বোঝার উপায় নেই।

নিবির রিনি কে থামার জন্য চোখ ইশারা দিল। ড্রইংরুমে পিন পতন নিরবতা। একটু পর রিনি 'আসি' বলে বেরিয়ে গেল।

আমি শুধু সেদিন নিবিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'বিয়ে কি ভেঙে গেছে?'

নিবির বলল, 'মাথা খারাপ? লোকে কি বলবে? বাবা-মা সবাইকে বলে ফেলেছে।'

আমি বললাম, 'হু'।

***

বিয়ের ঠিক পাঁচ দিন আগে আমি নিবিরকে ফোন দিলাম। কে জানে কী সার্কাস হচ্ছে! শুনলাম নিবিরের বিয়েতে দেন মোহর ঠিক হয়েছে ২৫ লাখ। নিবিরের বেতন ৫৮ হাজার। চাকরির বয়স দেড় বছর। বললাম, 'এত টাকা কই পাচ্ছিস রে?'

—কই আবার, কিছু বাবা দিচ্ছে, কিছু অফিস থেকে লোন করছি।

—হু।

আমি লাইন কেটে দিলাম।

***

আমার হাতের লেখা বেশ ভালো। মা বলে গোটা গোটা অক্ষর; কিন্তু কেন জানি কখনো কাউকে চিঠি লিখা হয়নি।

আমি বাবার ডাক্তারি প্যাড থেকে পাতা ছিঁড়ে এনে জীবনে প্রথম চিঠি লিখতে বসলাম। আফসোস! আমার সুন্দর হাতের লেখার প্রথম চিঠি আরেকটা ছেলেকে লিখছি। এই তথ্য ভুলেও আমার বউকে বলা যাবে না। মেয়ে মানুষ কথায় কথায় ফাজলামি করে। পরে কী না কী বলবে।

নিবির,

আমি কখনও বলি নাই আমি তোকে বেশ পছন্দ করি। কেন করি তা জানি না। তবে করি। আমাদের নবি বলেছেন—কাউকে ভালোবাসলে জানাতে হয়। তাই জানালাম। তুই সেই ছোটবেলা থেকে আমার বন্ধু। তাই বন্ধু হিসেবে কিয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করা হতে পারে, আমি তোকে জানিয়েছিলাম কি না, তাই লিখা।

তোকে জ্ঞানগর্ভ কথা বলে বোর করতে চাই না। রিনি ভালো না মন্দ তা আমি জানি না। জানতেও চাই না। তবে এতখানি বলতে চাই, তুই আর আমি আগে একই রকম ছিলাম। ধর, মানতাম আল্লাহ আছে, কিন্তু গাফিল। এর পর হঠাৎ করেই আমি কেমন বদলে গেলাম। নাম হলো হুজুরনিলয়, প্যান্টটাও টাখনুর উপর থাকে। এখনও চেষ্টা করছি, পারছি না কিছুই। তবে চেষ্টাটা জরুরি। আবার বদলে গেলি তুইও। রিনির সাথে তুই হয়ে গেলি নাস্তিক। নাস্তিক্যবাদ যে ভুল মতবাদ, আল্লাহ যে আছেন তা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট উপাদান আমি তোকে দিতেই পারতাম। ব্যাপার হলো সময়। হয়তো তুই সেগুলো ছুঁয়েও দেখতি না। তবে তোর জীবনের কয়েকটা বিষয় বলি। পয়েন্ট আকারেই বলি। কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারলে দিস। আর না পারলে ফিরে আয়। কোথায় ফিরবি তা বোঝার মতো জ্ঞান তোর আছে।

এক.

ব্যক্তিস্বাধীনতার মতবাদ মানা তুই সেদিন রিনির মার্কেটে হাতধরা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কেন মানতে পারিসনি? তবে কি এটা নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব হলো না?

দুই.

রিনির একটা কথার সাথে আমি একমত—তোদের ফ্যামিলি ট্রাডিশনটা একটু ঘুরিয়ে যৌতুক নেয়াতে বিশ্বাস করে। কিন্তু নাস্তিক হিসেবে হিন্দু ধর্ম থেকে আসা একটা প্রথা কেন গ্রহণ করেছিস, বলতে পারিস?

তিন.

রিনির সাম্যবাদ কিংবা তোর নারীবাদ কি বিয়েতে এত টাকা দেনমোহর—এই ব্যাপারটার সাথে কোনোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ? প্রথমত দেনমোহর ব্যাপারটা এসেছে ইসলাম থেকে। তার উপর এটাকে বিকৃত করে ব্যবহার করছে এক নাস্তিক পরিবার। এটা কেমন নাস্তিক্যবাদী এথিক্স?

চার.

ধরে নিচ্ছি তুই এবং রিনি নাস্তিক। তাহলে বিয়ের মতো একটা সম্পূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান তোরা গ্রহণ করছিস নিজেদের জীবনে। তাতে কাজি আসবে। বিয়ে পড়াবে। কেন? সমাজের ভয়ে? সমাজের ভয় তো তোদের পাবার কথা ছিল না।

পাঁচ.

পৃথিবী সুখের জায়গা না, কিন্তু মনের শান্তি কিন্তু পাওয়া যায়। কীভাবে সেটা পরে বলব। কিন্তু তোর মনে শান্তি আছে তো?

নিলয়।

***

বাকিটা ইতিহাস। কীভাবে কী হয়েছে জানি না। ভয়ে জানতেও চাইনি। ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নিবির আমার বাসায় এসে হাজির। এর মধ্যে আমি ওর সাথে কোনো যোগাযোগ করিনি। ইচ্ছে করেই করিনি।

আমি এইবার সত্যিই অবাক হলাম। চেহারায় অবাক অবাক ব্যাপারটা লুকোনোরও চেষ্টা করলাম না।

—তোর না বিয়ে।

—ভেঙে দিয়েছি দুই দিন আগে।

নিবির হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে বলল।

আমি কিছু জিজ্ঞেস না করে বললাম,

—তুই বোস। আমি মসজিদ যাচ্ছিলাম।

নিবির কোনো কথা না বলে টাখনুর প্যান্ট গুটিয়ে আমার সাথে রওনা দিল। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে। আমি বেশি ঘাঁটালাম না। আমার কেন জানি কান্না পাচ্ছে। পুরুষ মানুষের কান্নার যদিও নিয়ম নাই। তবে সব সময় নিয়ম মানাটাও কোনো কাজের কথা না। রাস্তা ভরতি ভালোবাসার ছড়াছড়ি। এরা কেমন আছে আমি জানি না, তবে নিবির সম্ভবত ভালো আছে।

***

আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। এই নিবিরটা কখন যে পানির টাংকি থেকে নামবে কে জানে। কষে পিঠে একটা থাপ্পড় দেওয়া দরকার।

একাকিত্বের অবসরে

খাদিজা তাহিরা

আশপাশে কেউ নেই কথা বলার মতো!

সারা দিনের কাজগুলো সেরে অবসরটুকু কাটে খুব যন্ত্রণায়। ছোট-ছোট টুকটাক কথাগুলোও ভেতরে বরফের পাথরখণ্ড হয়ে জমে থাকে।

অথবা পাশে মানুষজন থাকলেই কি! আমাকে বুঝবে, সঙ্গ দেবে সুখে-দুঃখে, মুখের দিকে তাকিয়ে-ই যে অনেক কিছু বুঝে নেবে, সংকটময় সময়গুলোতে কাঁধে হাত রেখে বলবে— 'You are not alone, I'm here with you'

এমন সঙ্গী যে কেউ নেই এটাই তো মূল নিঃসঙ্গতা।

বেলা শেষে সবাই একা, বড্ড নিঃসঙ্গ!

তাই না? খুব ব্যস্ত কিংবা সুখী মানুষটাও কাজের ফাঁকে কোনো এক মুহূর্তে আনমনা হয়ে ভাবে—'এলে এপারে কেউ কারও না।'

বুক ফুড়ে হঠাৎ একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস এসে ফিরে যায়। আর আমরা খুঁজে ফিরি—কীসে ঘুচবে এই একাকিত্ব?

সমাধানে খুঁজে ফিরি অবিবাহিতরা বিয়ের আর বিবাহিতরা ঝিয়ের।

এটা সহজাত, খুব সহজাত। সত্যি বলছি।